

দ্বিতীয় অধ্যায়

কম্পিউটার ও কম্পিউটার ব্যবহারকারীর নিরাপত্তা



এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- ➤ কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণে সফটওয়্যারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ➤ Software uninstall এবং Software delete -এর পার্থক্য করতে পারব;
- ➤ কম্পিউটার, তথ্য-উপাত্ত ও Software -এর নিরাপত্তায় পাসওয়ার্ড ও এন্টি ভাইরাস ব্যবহারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ➤ সাধারণ ও সামাজিক সাইটসমূহের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারব;
- ➤ অতিমাত্রায় ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ➤ অতিমাত্রায় গেমস্ খেলার নেতিবাচক দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ➤ সফটওয়্যার পাইরেসির বিষয়টি বর্ণনা করতে পারব;
- ➤ কপিরাইট আইনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ➤ ইন্টারনেটে তথ্যের অবাধ প্রবাহের সাথে সাথে নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ➤ কম্পিউটারের ট্রাবল শ্যুটিং-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ➤ যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে নির্দিষ্ট Software install/uninstall করতে পারব;
- ➤ Unique পাসওয়ার্ড তৈরি করতে পারব; এবং
- ➤ কম্পিউটারের সাধারণ সমস্যার ট্রাবল শ্যুট করতে পারব।

কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণে সফটওয়্যারের গুরুত্ব

ঘটনা ১ : রায়না কলেজে ভর্তি হওয়ার পর বাবার কাছে বায়না ধরেছিল একটি ল্যাপটপ কিনে দেবার জন্য। বাবা প্রথম সাময়িকের ফল ভালো হওয়ায় রায়নাকে একটি কোর আই ফাইভ প্রসেসরযুক্ত একটি ল্যাপটপ কিনে দিলেন। ল্যাপটপ পেয়ে এবং এর গতি দেখে রায়না মুগ্ধ। সে কিছুদিনের মধ্যেই অনেক সফটওয়্যার ইনস্টল করে ফেলল। কিন্তু রায়না লক্ষ করল তার ল্যাপটপটি আশ্বে আশ্বে ধীরগতির হয়ে যাচ্ছে। এক বছরের মাথায় এসে রায়না দেখল তার ল্যাপটপটি এতটাই ধীর হয়ে গেছে যে, কাজ করতে গিয়ে রায়না মহা বিরক্ত। কিছুদিন পর সে বাবাকে আরেকটি ল্যাপটপ কিনে দেওয়ার জন্য আবদার করল।

ঘটনা ২ : অংকন তার কম্পিউটারে ইন্টারনেট কানেকশন নিয়েছে। এখন সে প্রায়ই ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে। এতে তার লেখাপড়ার অনেক উপকার হচ্ছে। লেখাপড়া ছাড়াও সে বন্ধুদের ই-মেইল করা, গান শোনা ও ছবি দেখার কাজেও ইন্টারনেট ব্যবহার করে। ইদানীং সে দেখছে কম্পিউটারটি কোনো কারণ ছাড়াই মাঝে মধ্যে রিস্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও মাঝে মাঝে অংকনের ইচ্ছা ছাড়াই বিভিন্ন ওয়েব সাইটে ঢুকে যাচ্ছে। একদিন ইউএসবি পোর্টে পেনড্রাইভ প্রবেশ করালে সে অবাক হয়ে দেখল তার সব ফাইল শটকাট হয়ে গেছে। মূল ফাইলগুলো কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

উপরের ঘটনা দুটো থেকে তোমরা কী বুঝলে? তোমাদের অনেকের অভিজ্ঞতার সাথে মিলে যাচ্ছে? তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্মুখে এতদিনে তোমাদের অনেক কিছুই জানা হয়ে গেছে। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রসেসর ও সফটওয়্যার নির্ভর যন্ত্রই হলো মূল যন্ত্র। নতুন একটি কম্পিউটার তা ডেস্কটপ, ল্যাপটপ বা ট্যাবলেট যাই হোক না কেন দেখবে খুব ভালো বা দ্রুতগতিতে কাজ করছে। কিন্তু কিছুদিন ব্যবহার করার পরে দেখবে এটি ক্রমশ ধীরগতির হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ পুরনো হলে যন্ত্রটি কেমন যেন ধীর হয়ে যায়। অনেক সময় একটি কমান্ড দিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। মাঝে মাঝে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, রাগান্বিত হয়ে আরেকটি নতুন কম্পিউটার কিনে ফেলতে ইচ্ছা করে!

এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় তাহলে কী? এখানেই রয়েছে কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব। নিচের শ্রেণিতে তোমরা রক্ষণাবেক্ষণ সম্মুখে কিছুটা জেনেছ। বেশিরভাগ মানুষেরই আইসিটি যন্ত্রপাতি বা অন্য কোনো যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি করতে ভালো লাগে না। কিন্তু তারপরও এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তুমি যদি তোমার আইসিটি যন্ত্র বা কম্পিউটারটি সচল ও পূর্ণমাত্রায় কার্যক্ষম রাখতে চাও তবে অবশ্যই এটির রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। একাজের জন্য তোমার যন্ত্রপাতি বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নাই। আসলে আমরা এখানে আইসিটি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে সফটওয়্যার ভিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণের কথা বলছি।

তোমার আইসিটি যন্ত্রটিতে যদি মাইক্রোসফট কোম্পানির উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে (বিশেষ করে বেশিরভাগ কম্পিউটারে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহৃত হয়) থাকে তবে অপারেটিং সিস্টেম সবসময় হালনাগাদ বা আপডেট করতে হবে। ইন্টারনেটে সংযুক্ত থাকলে এ আপডেটগুলো সাধারণত স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে থাকে। অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেমও প্রায় একই ধরনের সুবিধা দিয়ে থাকে। তাছাড়া তোমাকে অবশ্যই মাঝে মাঝে রেজিস্ট্রি ক্লিনআপ সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে কম্পিউটারকে সচল ও গতিশীল রাখার জন্য। যদি রেজিস্ট্রি ক্লিনআপ ব্যবহার না কর তোমার কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্রটি ঠিকভাবে কাজ করবে না এবং তোমার জন্য অনেক সময় বিরক্তির কারণ হবে।

এছাড়াও প্রত্যেকবার কম্পিউটার ব্যবহার করার সময় বেশকিছু টেম্পোরারি ফাইল তৈরি হয়। অনেকদিন এ ফাইলগুলো না মুছে দিলে হার্ডডিস্কের অনেকটা জায়গা দখল করে রাখে এবং কম্পিউটারের গतिकে ধীর করে দেয়। সে জন্য আমাদের সবারই উচিত সফটওয়্যারের সাহায্য নিয়ে টেম্পোরারি ফাইলগুলো মুছে দেওয়া। এতে হার্ডডিস্কের বেশ খানিকটা জায়গা খালি হবে আবার কম্পিউটারের কাজ করার গতিও বেড়ে যাবে অনেক।

ইদানীং ইন্টারনেট ব্যবহার করা ছাড়া আইসিটি যন্ত্রের ব্যবহার কল্পনা করা যায় না। ইন্টারনেট ব্যবহার করলে তোমার ইন্টারনেট ব্রাউজারের ক্যাশ মেমোরিতে অনেক কুকিজ ও টেম্পোরারি ফাইল জমা হয়। এতে আইসিটি যন্ত্রটি ক্রমান্বয়ে ধীর হয়ে যায়। প্রতিদিন সম্ভব না হলেও কিছুদিন পর পর ক্যাশ মেমোরি পরিষ্কার করা একান্ত প্রয়োজন। এ কাজটি করতে সফটওয়্যার তোমাকে সাহায্য করবে।

এন্টিভাইরাস, এন্টি স্পাইওয়্যার ও এন্টি ম্যালওয়্যার ছাড়া বর্তমানে আইসিটি ডিভাইস ব্যবহার করা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। এধরনের সফটওয়্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম যার মাধ্যমে আইসিটি যন্ত্র ব্যবহারকারীগণ তাদের যন্ত্রে ভাইরাসসহ ম্যালওয়্যার বা স্পাইওয়্যারের আক্রমণ থেকে রক্ষা পান। পাশাপাশি নির্বিঘ্নে তাদের যন্ত্র বা যন্ত্রগুলো ব্যবহার করতে পারেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এখন অনেক এন্টিভাইরাস এবং এন্টি ম্যালওয়্যার বা এন্টি স্পাইওয়্যার বিনামূল্যে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যায়। এমনকি এ সফটওয়্যারগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে হালনাগাদও (update) করা যায়। হালনাগাদ এন্টিভাইরাস ছাড়া আইসিটি যন্ত্র ব্যবহার করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

কম্পিউটারের কাজ করার গতি বজায় রাখার জন্য প্রায় সব ব্যবহারকারী ডিস্ক ক্লিনআপ ও ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার ব্যবহার করে থাকে। এ প্রোগ্রামগুলো সাধারণত অপারেটিং সিস্টেমের সাথে যুক্ত থাকে। এ সফটওয়্যার দুটো হার্ডডিস্কের জায়গা খালি করে এবং ফাইলগুলো এমনভাবে সাজায় যাতে কম্পিউটার গতি বজায় রেখে কাজ করতে পারে।

সফটওয়্যার ইনস্টলেশন ও আনইনস্টলেশন

আমরা সবাই জানি আইসিটি যন্ত্রগুলো সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ সফটওয়্যারগুলো কম্পিউটার বা অন্যান্য যন্ত্রে ইনস্টল করতে হয়। আমরা যখন কোনো আইসিটি যন্ত্র কিনি তখন বিক্রেতা সাধারণত আমাদের জিজ্ঞাসা করে আমাদের কোন কোন সফটওয়্যার প্রয়োজন। অতঃপর অপারেটিং সফটওয়্যারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারগুলো বিশেষজ্ঞ দিয়ে ইনস্টল করে বিক্রেতা যন্ত্রটি আমাদের কাছে হস্তান্তর করে। এভাবে আমরা নিজেদের প্রয়োজনমতো আইসিটি যন্ত্র তথা কম্পিউটার, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি।

অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার ইনস্টল করার প্রক্রিয়া একটু জটিল এবং এর জন্য কিছু বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এ কাজটি নিয়ে আমরা পরবর্তী শ্রেণিতে আলোচনা করব। অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার ছাড়াও আইসিটি যন্ত্র ব্যবহার করতে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার প্রয়োজন হয়। এ সফটওয়্যারগুলো ব্যবহারকারীর যন্ত্রটি ব্যবহারের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে ইনস্টল করতে হয়।

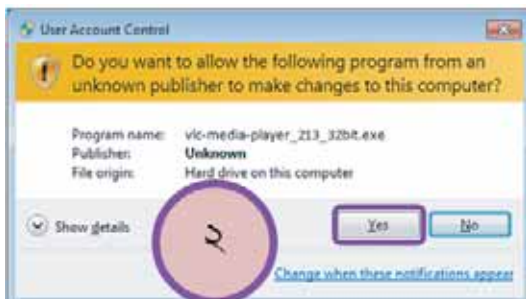
কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করার পূর্বে নিচের বিষয়গুলো লক্ষ রাখা প্রয়োজন:

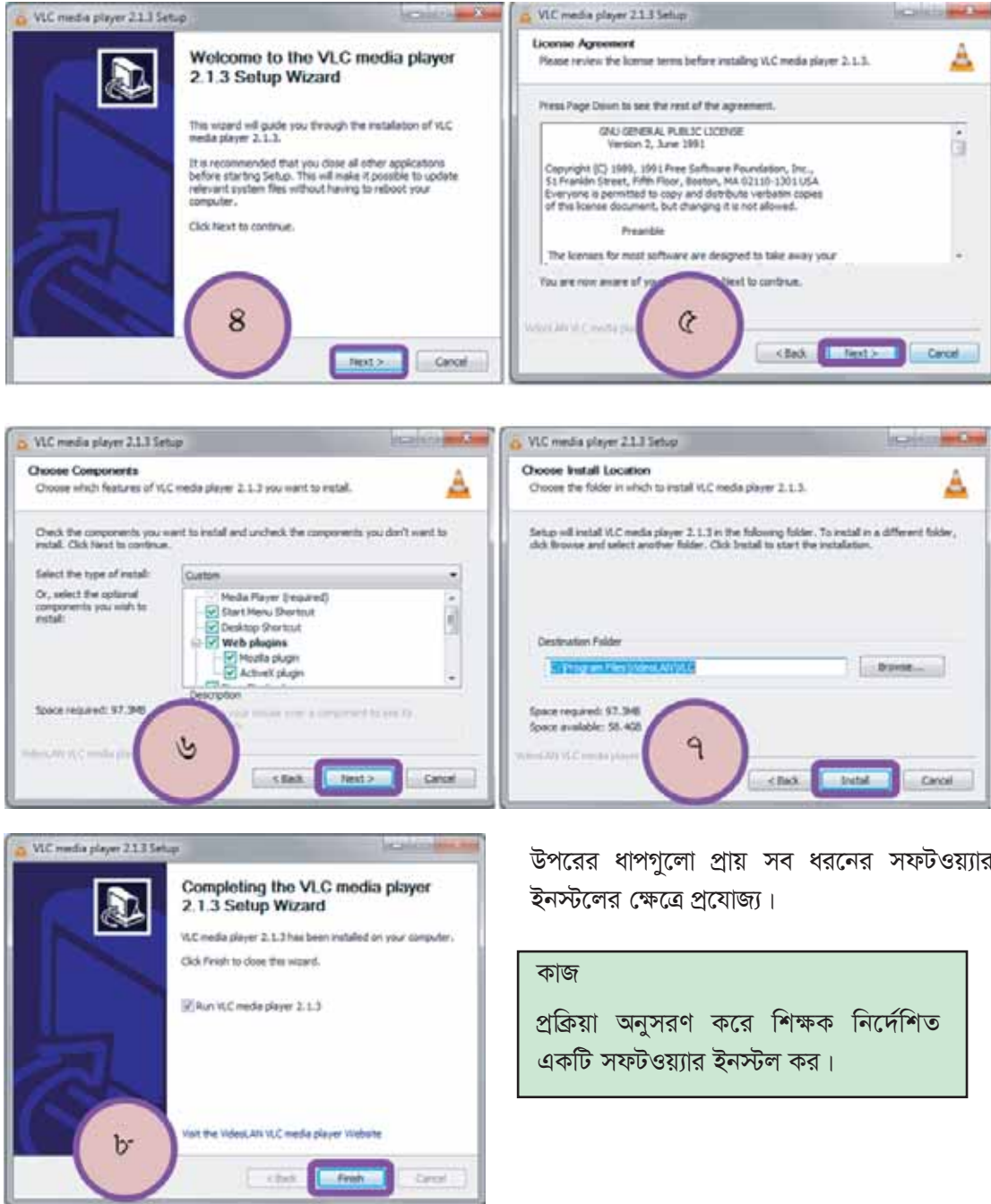
- □ যে সফটওয়্যার ইনস্টল করা হবে তা তোমার যন্ত্রের হার্ডওয়্যার সাপোর্ট করে কিনা;
- □ read me ফাইলটিতে জরুরি কিছু কাজের কথা লেখা আছে কিনা পড়ে নিতে হবে;
- □ ইনস্টলেশনের সময় অন্য সকল কাজ বন্ধ আছে কিনা (বন্ধ না থাকলে অনেক সময় নতুন সফটওয়্যার ইনস্টল করতে ঝামেলা হয়);
- □ এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার বন্ধ আছে কিনা; এবং
- অপারেটিং সিস্টেমের এডমিনিস্ট্রেটরের অনুমতি আছে কিনা (বিশেষ কোনো যন্ত্র ছাড়া প্রায় সব যন্ত্রেরই এ অনুমোদন দেওয়া থাকে। বিষয়টি সমস্মৃক আমরা পরবর্তী শ্রেণিতে বিস্তারিত জানব)।

অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার ছাড়া অন্যান্য সফটওয়্যার ইনস্টল করার প্রক্রিয়া অনেকটাই অপারেটিং সিস্টেমের ওপর নির্ভর করে। তবে এ প্রক্রিয়া অনেকটা একই ধরনের। কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হলে প্রথমেই আমাদের সফটওয়্যারটির সফট বা ডিজিটাল কপি প্রয়োজন হবে। এ সফট কপিটি সিডি, ডিভিডি, পেনড্রাইভ বা ইন্টারনেট থেকে পাওয়া যেতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সফটওয়্যারগুলোর সাথে Auto run নামে একটি প্রোগ্রাম সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। তোমাদের কম্পিউটারে সিডি, ডিভিডি বা পেনড্রাইভ প্রবেশ করলে Auto run প্রোগ্রামটি সচল হয়ে যায় এবং সফটওয়্যারটি setup করার অনুমতি চায়। অনুমতি প্রদান করার পর পরবর্তী ধাপগুলো অনুসরণ করলেই সফটওয়্যারটি তোমার যন্ত্রে ইনস্টল হয়ে যাবে। সাধারণত যন্ত্রটি restart করলেই ইনস্টলকৃত প্রোগ্রামটি ব্যবহার করা শুরু করা যায়।

একটি সফটওয়্যার ইনস্টল করার ধাপগুলো দেখানো হলো :

প্রথমে সফটওয়্যারের সেটআপ ফাইলে ডাবল ক্লিক করতে হবে। যেমন, নিচের চিত্র-১ একটি সেটআপ ফাইল। এটাতে ডাবল ক্লিক করলে ইনস্টলেশন শুরু হবে।





উপরের ধাপগুলো প্রায় সব ধরনের সফটওয়্যার ইনস্টলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কাজ

প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শিক্ষক নির্দেশিত একটি সফটওয়্যার ইনস্টল কর।

সফটওয়্যার আনইনস্টলেশন

ইনস্টল করতে শিখে ফেললে! এখন মনে কর ইনস্টল করা কোনো একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করার আর প্রয়োজন নেই। তাহলে আমরা কী করব? বেশিরভাগ ব্যবহারকারী সফটওয়্যারটি তার যন্ত্রেই রেখে দেয়। কিন্তু

এতে হার্ডডিস্কের অনেকটা জায়গা নষ্ট হয়। আবার অনেক সময় আইসিটি যন্ত্রটি পরিচালনা করতে ঝামেলা সৃষ্টি করে। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হলো অপ্রয়োজনীয় সফটওয়্যার আনইনস্টল করে ফেলা।

এখন প্রশ্ন হলো আনইনস্টল কীভাবে করব? এ কাজটি করতেও অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার আমাদের সাহায্য করে থাকে। প্রায় সব অপারেটিং সিস্টেমের কাজের ধরন একই। তবে এন্ড্রয়েড চালিত যন্ত্র বিশেষ করে হাতের আঙ্গুলের স্পর্শ দ্বারা পরিচালিত অর্থাৎ টাচস্ক্রিনযুক্ত স্মার্টফোনগুলো থেকে সফটওয়্যার আনইনস্টল করা খুবই সহজ। সেটিংস থেকে অ্যাপ্লিকেশন সিলেক্ট করে নির্দিষ্ট সফটওয়্যারটিতে টাচ করলে পর্দায় একটি মেনু আসবে। সেখানে আনইনস্টল লেখা জায়গায় টাচ করার পর সফটওয়্যারটি আনইনস্টল হয়ে যাবে।

মাইক্রোসফট উইন্ডোজ-এর অপারেটিং সিস্টেম যা কিনা বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ তাদের আইসিটি যন্ত্রে তথা কম্পিউটারে ব্যবহার করে থাকে, সেসব যন্ত্র হতে সফটওয়্যার আনইনস্টল করতে হলে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

প্রথমে স্টার্ট বাটন থেকে কন্ট্রোল প্যানেলে যেতে হবে। অতঃপর ডাবল ক্লিক করে ‘অ্যাড অর রিমুভ’ অথবা ‘আনইনস্টল প্রোগ্রাম’ -এ ঢুকতে হবে।



কাজ

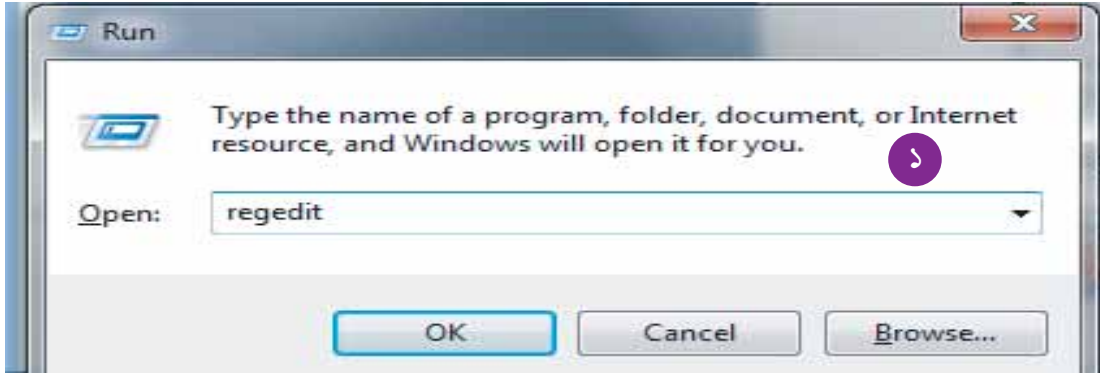
প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শিক্ষক নির্দেশিত একটি সফটওয়্যার আনইনস্টল কর।

এরপর যে প্রোগ্রামটি আনইনস্টল করতে চাও সেটি খুঁজে ক্লিক করে আনইনস্টলে ক্লিক করলেই ফাইলটি আনইনস্টল হতে শুরু করবে। ফাইল বড় হলে আনইনস্টল হতে একটু বেশি সময় লাগতে পারে। আনইনস্টল করার পর সাধারণত কম্পিউটার রিস্টার্ট করতে হয়। তবে কোনো সফটওয়্যার আনইনস্টল করার সময় নিশ্চিত হয়ে তা করতে হবে। অন্যথায় ভুলক্রমে এমন সফটওয়্যার আনইনস্টল হতে পারে, যার কারণে তোমার যন্ত্রটিতে পুনরায় সফটওয়্যারটি ইনস্টল করা ছাড়া চালানো সম্ভব নাও হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

সফটওয়্যার ডিলিট

আমরা জানি ডিলিট অর্থ মুছে ফেলা। মূলত সফটওয়্যার আনইনস্টল করার মাধ্যমে আমরা আমাদের আইসিটি যন্ত্র হতে ইনস্টল করা যেকোনো সফটওয়্যার মুছে ফেলতে পারি। নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে তাহলে ডিলিট দিয়ে কী করব? কম্পিউটার বা অন্য যেকোনো আইসিটি যন্ত্রে কোনো সফটওয়্যার একবার ইনস্টল করলে আনইনস্টলের মাধ্যমে তা সম্পূর্ণ মুছে ফেলা যায় না। আবার নিয়ম না মেনে শুধু সফটওয়্যারটি ডিলিট করে দিলে সফটওয়্যারটি মুছে তো যায়ই না বরং আরো সমস্যা তৈরি করে। আনইনস্টল করলে সফটওয়্যারটির কিছু অংশ অপারেটিং সিস্টেমের রেজিস্ট্রি ফাইলে থেকে যায়। নিয়ম অনুসরণ করে ডিলিট করলে যেকোনো সফটওয়্যার সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা সম্ভব। নিচে নিয়মটি দেখানো হলো। এ কাজটি করতেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

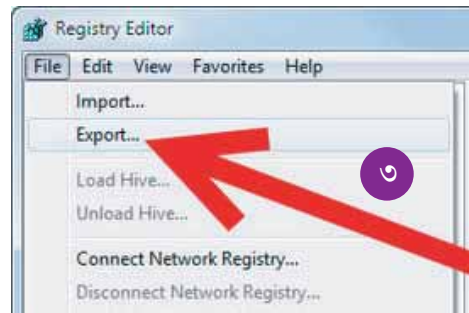
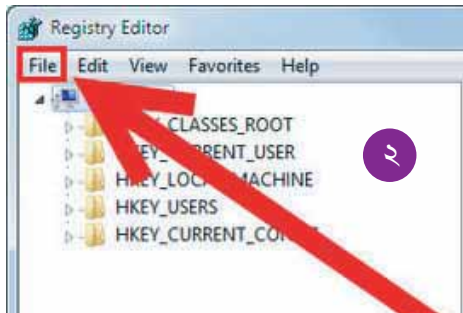
ডিলিট করতে যা করতে হবে : প্রথমে পূর্বের নিয়মে সফটওয়্যারটি আনইনস্টল করতে হবে। পরে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।



১. প্রথমে কীবোর্ডের  + r একসাথে চেপে Run Command চালু করতে হবে। তারপর regedit লিখে ok বাটন ক্লিক করতে হবে।

২. ফাইল মেনুতে প্রবেশ করতে হবে।

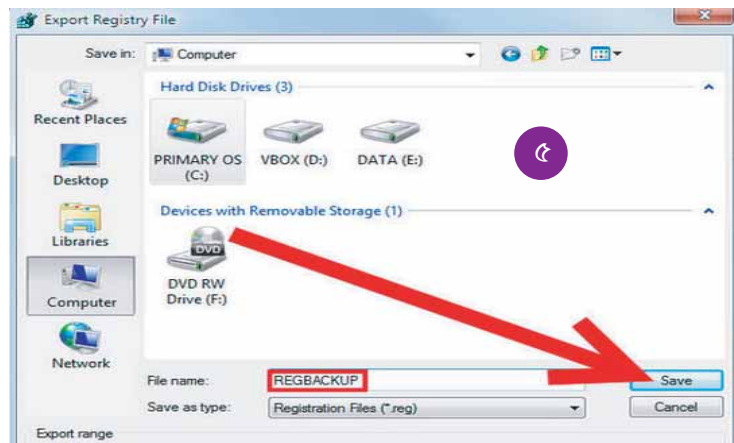
৩. Export -এ ক্লিক করতে হবে।



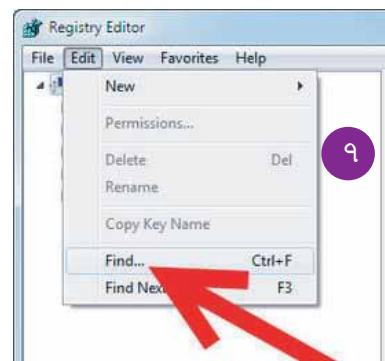
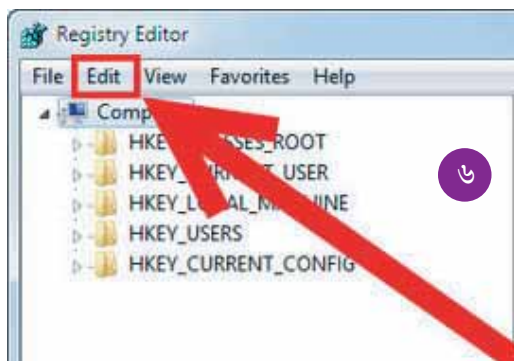
৪. অপারেটিং সফটওয়্যার যে ড্রাইভে রয়েছে অর্থাৎ C সিলেক্ট করতে হবে।



৫. নাম দিয়ে ফাইলটি সেভ করতে হবে। এটি খুবই জরুরি। কোনো ভুল হলে যাতে সিস্টেম ঠিক করা যায়।



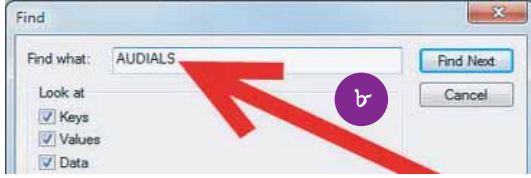
৬. অতঃপর Edit -এ প্রবেশ করতে হবে।



৭. Find -এ যেতে হবে।

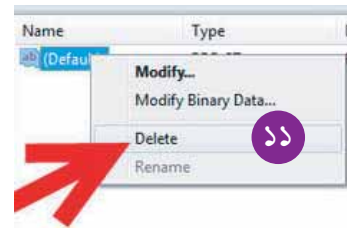
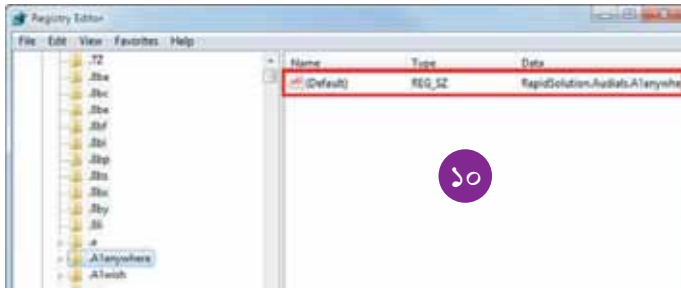
৮. যে সফটওয়্যারটি ডিলিট করতে চাই তার নাম খুঁজতে হবে, যেমন এখানে AUDIALS

৯. Find Next -এ ক্লিক করতে হবে।



১০. এভাবে সিলেক্ট করতে হবে।

১১. এবার ডান বাটন ক্লিক করে Delete -এ ক্লিক করে করতে হবে।



১২. সবশেষে কীবোর্ডের F3 চেপে রেজিস্ট্রির সব জায়গা থেকে ঐ নামের ফাইলগুলো মুছে দিতে হবে। এভাবেই সম্পূর্ণ হবে পুরো সফটওয়্যার ডিলিট করার প্রক্রিয়া।

দলগত কাজ

আনইনস্টল এবং ডিলিটের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে উপস্থাপন কর।

নিজের কম্পিউটারের নিরাপত্তা – কম্পিউটার ভাইরাস ও এন্টিভাইরাস



কম্পিউটার ভাইরাস বিষয়ে আমরা অনেক কিছুই ইতোমধ্যে জেনে ফেলেছি। তবু আমাদের আইসিটি যন্ত্রের নিরাপত্তার কথাটি মাথায় রেখে এ বিষয়ে আরও জানা প্রয়োজন। প্রাণীদেহে ভাইরাস আক্রমণের মতোই এ ভাইরাসগুলো আমাদের আইসিটি যন্ত্রের ক্ষতি করে থাকে। VIRUS শব্দের পূর্ণরূপ হলো Vital Information Resources Under Siege যার অর্থ দাঁড়ায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ দখলে নেওয়া বা ক্ষতি সাধন করা। ১৯৮০ সালে এ নামকরণ করেছেন প্রখ্যাত গবেষক 'University of New Haven'-এর অধ্যাপক ফ্রেড কোহেন (Fred Cohen)। ভাইরাস হলো এক ধরনের সফটওয়্যার যা তথ্য ও উপাত্তকে আক্রমণ করে এবং যার নিজের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষমতা রয়েছে। ভাইরাস কম্পিউটারে প্রবেশ করলে সাধারণত সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে ও বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তকে আক্রমণ করে এবং এক পর্যায়ে গোটা কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্রকে সংক্রমিত করে অচল করে দেয়। যেমন- বুট ভাইরাস ডিস্কের বুট সেক্টরকে আক্রমণ করে। অতি পরিচিত কিছু ভাইরাস হলো স্টোন (Stone), ভিয়েনা (Vienna), সিআইএইচ (CIH), ফোল্ডার (Folder), Trojan Horse ইত্যাদি।

কোনোভাবে কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্র ভাইরাসে সংক্রমিত হলে তা ক্রমে ক্রমে বিস্ময় ঘটবে। সিডি, পেনড্রাইভ কিংবা অন্য যেকোনোভাবে ভাইরাসযুক্ত একটি ফাইল ভাইরাসযুক্ত কম্পিউটার বা কোনো আইসিটি যন্ত্রে চালালে ফাইলের সংক্রমিত ভাইরাস কম্পিউটার বা যন্ত্রটির মেমোরিতে অবস্থান নেয়। কাজ শেষ করে ফাইল বন্ধ করলেও সংক্রমিত ভাইরাসটি মেমোরিতে রয়েই যায়। ফলে ভাইরাসযুক্ত কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্র ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। একই অবস্থা ঘটে কোনো ভাইরাস সংক্রমিত প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার চালালেও।

এভাবে মেমোরিতে স্থান দখলকারী ভাইরাস পরবর্তীতে অন্যান্য প্রোগ্রাম এবং ফাইলকেও আক্রমণ করে। কোনো কোনো ভাইরাস তাৎক্ষণিকভাবে সকল প্রোগ্রাম ও ফাইলকে গ্রাস করে, আবার কোনো কোনো ভাইরাস শুধু নতুন প্রোগ্রাম ও ফাইলকেই আক্রান্ত করে। ফাইল ও প্রোগ্রামসমূহ গ্রাস করতে করতে ভাইরাস তার ই ছামতো কম্পিউটারের অভ্যন্তরে সার্বিক ক্ষতি সাধন শুরু করে। এভাবে একটি ভাইরাসযুক্ত কম্পিউটার ধীরে ধীরে ভাইরাসে সংক্রমিত হয় এবং উক্ত সংক্রমিত কম্পিউটারে ব্যবহৃত সিডি, হার্ডডিস্ক, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে ভাইরাসটি অন্যান্য কম্পিউটারে ছড়িয়ে পড়ে।

কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্র ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণসমূহ:

- প্রোগ্রাম ও ফাইল Open করতে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে
- মেমোরি কম দেখাচ্ছে ফলে গতি কমে গেছে
- কম্পিউটার চালু অবস্থায় চলমান কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কিছু অপ্রত্যাশিত বার্তা প্রদর্শিত হচ্ছে
- নতুন প্রোগ্রাম ইনস্টলের ক্ষেত্রে বেশি সময় লাগছে
- চলমান কাজের ফাইলগুলো বেশি জায়গা দখল করছে
- যন্ত্র চালু করার সময় চালু হতে হতে বন্ধ বা শাট ডাউন হয়ে যাচ্ছে কিংবা কাজ করতে করতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বা রিস্টার্ট হচ্ছে
- ফোল্ডারে বিদ্যমান ফাইলগুলোর নাম পরিবর্তন হয়ে গেছে ইত্যাদি।

ভাইরাস সাধারণত যা যা ক্ষতি করতে পারে :

- কম্পিউটারে সংরক্ষিত কোনো ফাইল মুছে দিতে পারে
- ডেটা বিকৃত বা Corrupt করে দিতে পারে
- কম্পিউটারে কাজ করার সময় আচমকা অবাঞ্ছিত বার্তা প্রদর্শন করতে পারে
- কম্পিউটার মনিটরের ডিসপ্লেকে বিকৃত বা Corrupt করে দিতে পারে
- সিস্টেমের কাজকে ধীরগতি সম্পন্ন করে দিতে পারে।

এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে আমরা কী করতে পারি? এখানেই এন্টিভাইরাসের কথা এসে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এন্টিভাইরাস আমাদেরকে এ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে। কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্রের ভাইরাসের প্রতিষেধক হলো এন্টিভাইরাস। সিস্টেম ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে এটি নির্মূল করতে হয়। ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে এন্টিভাইরাস ইউটিলিটি ব্যবহার করা হয়। এই ইউটিলিটিগুলো প্রথমে আক্রান্ত কম্পিউটারে ভাইরাসের চিহ্নের সাথে পরিচিত ভাইরাসের চিহ্নগুলোর মিলকরণ করে। অতঃপর

এন্টিভাইরাস সফটওয়্যারটি তার পূর্বজ্ঞান ব্যবহার করে সংক্রমিত অবস্থান থেকে আসল প্রোগ্রামকে ঠিক করে। একটি ভালো এন্টিভাইরাস সাধারণভাবে প্রায় সব ধরনের ভাইরাস নির্মূল করতে পারে। নতুন ভাইরাস আবিষ্কৃত হওয়ার সাথে সাথে এন্টিভাইরাস Update করলে এর শক্তি ও কার্যক্ষমতা প্রতিনিয়ত উন্নত হয়। ফলে নতুন নতুন ভাইরাস ধ্বংস করতে পারে। বর্তমানে অনেক এন্টিভাইরাস রয়েছে যেগুলো ভাইরাস চিহ্নিত করে, নির্মূল করে এবং প্রতিহত করে। আজকাল প্রায় প্রত্যেক অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যারের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার দেওয়া থাকে। এছাড়াও এখনকার এন্টিভাইরাসগুলো ভাইরাস আক্রমণ করার পূর্বেই তা ধ্বংস করে অথবা ব্যবহারকারীকে সতর্ক করে। ফলে এগুলো পূর্বের এন্টিভাইরাসের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর। এখানে একটি কথা অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যে এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার সবসময় হালনাগাদ (Update) রাখতে হবে।

ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আজকাল বিনামূল্যে ইন্টারনেট থেকে এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার ডাউনলোড এবং ইনস্টল করে আইসিটি যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা অনেকাংশ নিশ্চিত করা যায়। উল্লেখযোগ্য কিছু এন্টিভাইরাস প্রোগ্রামের নাম হলো-

- ☐ এভিজি এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার (ডাউনলোড ওয়েবসাইট www.avg.com)
- ☐ এভিরা এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার (ডাউনলোড ওয়েবসাইট www.avira.com)
- ☐ এভাস্ট এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার (ডাউনলোড ওয়েবসাইট www.avast.com)

কম্পিউটার বা আমাদের আইসিটি যন্ত্রগুলোকে ভাইরাসমুক্ত রেখে ব্যবহার করতে আমরা নিচের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে পারি।

১. অন্য যন্ত্রে ব্যবহৃত সিডি, পেনড্রাইভ, মেমোরি কার্ড ইত্যাদি নিজের যন্ত্রে ব্যবহারের পূর্বে ভাইরাস মুক্ত করে নেয়া। (এন্টি ভাইরাস দ্বারা স্ক্যান করে নেওয়া)
২. অন্য কম্পিউটার থেকে কপি কৃত সফটওয়্যার নিজের কম্পিউটারে ব্যবহারের আগে সফটওয়্যারটিকে ভাইরাস মুক্ত করা;
৩. অন্য যন্ত্রের কোনো ফাইল নিজের যন্ত্রে ব্যবহারের পূর্বে ফাইলটিকে ভাইরাস মুক্ত করা;
৪. ইন্টারনেট থেকে কোনো সফটওয়্যার নিজের কম্পিউটারে ডাউনলোড করে ইনস্টল করার সময়ে সতর্ক থাকা। কারণ, ডাউনলোডকৃত সফটওয়্যারে ভাইরাস থাকলে তা থেকে তোমার কম্পিউটারটিও ভাইরাস আক্রান্ত হতে পারে।
৫. অন্যান্য কম্পিউটারে বা যন্ত্রে ব্যবহৃত সফটওয়্যার কপি করে ব্যবহার না করা।
৬. কম্পিউটারে ভাইরাস প্রবেশ করলে সতর্কতামূলক বার্তা প্রদর্শন করার জন্য এন্টিভাইরাস সফটওয়্যারটিকে হালনাগাদ করে রাখা প্রয়োজন;
৭. প্রতিদিনের ব্যবহৃত তথ্য বা ফাইলসমূহ আলাদা কোনো ডিস্ক বা পেনড্রাইভে ব্যাকআপ রাখা, তবে এক্ষেত্রে ডিস্ক বা পেনড্রাইভটি অবশ্যই ভাইরাস মুক্ত হতে হবে;
৮. ই-মেইল আদান-প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন করা। যেমন : সন্দেহজনক সোর্স থেকে আগত ই-মেইল open না করা। করলেও ভাইরাসমুক্ত করে তা খোলা উচিত।
৯. গেম ফাইল ব্যবহারের আগে অবশ্যই ভাইরাস চেক করতে হবে।

পাসওয়ার্ড

পরিবারের সবাই বাড়ির বাইরে বেড়াতে গেলে সাধারণত আমরা বাড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে যাই। কেন? বাড়ির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, তাই না। এখন একটু চিন্তা কর, তালা জিনিসটা আসলে কী? যে কেউ যেকোনো চাবি দিয়ে তোমার বাড়ির তালাটি খুলতে পারে না। কারণ পৃথিবীর প্রত্যেকটি তালাই জন্যে ভিন্ন ভিন্ন চাবি রয়েছে। এক তালাই চাবি দিয়ে অন্য একটি তালা খোলা যায় না। এভাবে আমরা তালা দিয়ে আমাদের বাড়িসহ অন্যান্য জিনিসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করি। এখন অবশ্য নম্বর দেওয়া এক ধরনের তালা দেখা যায়, যেখানে নম্বর মিলিয়ে তালাটি খুলতে হয়। এক্ষেত্রে নম্বরটি চাবির কাজ করে। কিন্তু ডিজিটাল প্রযুক্তির এ যুগে আরো অনেক কিছুর নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হয়। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছ কিসের কথা বলছি।

ঠিক ধরেছ, আমরা আমাদের তথ্য ও উপাত্তের নিরাপত্তার কথা বলছি। আইসিটির এ যুগে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, উপাত্ত ও সফটওয়্যার নিরাপত্তায় এক ধরনের তালা দিতে হয়। এ তালাই নাম পাসওয়ার্ড।

তোমরা অনেকে নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে পাসওয়ার্ড তৈরি ও ব্যবহার করে ফেলেছ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এখন সবখানে। আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এর প্রসার যত বাড়ছে নিরাপত্তার প্রশ্নটি তত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। আমাদের ব্যক্তিগত সকল তথ্য যেমন ব্যাংক একাউন্ট, আয়করের হিসাব, চাকরির বিভিন্ন তথ্য ইত্যাদি ছাড়াও নানা তথ্য-উপাত্ত এখন ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় আসছে। এছাড়াও আমাদের আইসিটি যন্ত্রপাতি যেমন কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট কিংবা মোবাইল ফোনগুলো সফটওয়্যার দ্বারা পরিচালিত হয়। আমরা যখন ইন্টারনেট ব্যবহার করি তখন পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্রের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। তেমনি অন্য যে কেউ আমাদের যন্ত্রের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে। এর মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্যও অন্যের কাছে চলে যেতে পারে কিংবা কেউ আমাদের যন্ত্রের সফটওয়্যারের ক্ষতি করতে পারে। এ অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে আমাদের নিরাপত্তা প্রয়োজন। এসব তথ্য ও আমাদের যন্ত্রের সফটওয়্যারসমূহ রক্ষা করতে পাসওয়ার্ডের কোনো বিকল্প নেই। পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকলে যে কেউ ইচ্ছা করলেই আমাদের তথ্য নিতে পারবে না বা ক্ষতি করতে পারবে না। তবে এখানে একটি কথা অবশ্যই জেনে রাখতে হবে যদি কেউ বুদ্ধি খাটিয়ে আমরা যে পাসওয়ার্ড দিয়েছিলাম তা ধরে ফেলতে পারে তাহলে সে আমাদের সকল তথ্য নিয়ে নিতে পারবে। তথ্য নষ্ট করতে চাইলে নষ্ট করতে পারবে। অনেকটা ডুপ্লিকেট চাবি বানিয়ে তালা খুলে ফেলার মতো। তাই পাসওয়ার্ড তৈরি করতে আমাদের অনেক দক্ষ হতে হবে। অন্য কেউ ধারণা করতে পারে এমন সহজ পাসওয়ার্ড যেমন তৈরি করা যাবে না আবার নিজেই ভুলে যেতে পারি এমন পাসওয়ার্ড তৈরি করা যাবে না।

বেশিরভাগ মানুষ 123456 বা 654321 বা abcdef এ ধরনের পাসওয়ার্ড তৈরি করে। ফলে পাসওয়ার্ড জেনে যাওয়া বা ধরে ফেলা সহজ হয়। যদিও অনেক ব্যবহারকারী অনন্য বা unique পাসওয়ার্ড তৈরি করাকে ঝামেলার কাজ মনে করে। তথ্য-উপাত্তের দিকটি বিবেচনায় নিলে unique বা মৌলিক পাসওয়ার্ড তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সার্ভার, কম্পিউটার বা যেকোনো আইসিটি যন্ত্রে রক্ষিত তথ্য ও উপাত্তের নিরাপত্তা বিধানের সাথে সাথে

গোপনীয়তা বজায় রাখার কাজটিও পাসওয়ার্ড করে থাকে। তোমার পাসওয়ার্ড যদি unique না হয় তবে:

১. দুর্বল পাসওয়ার্ডের কারণে ভাইরাস সহজেই আক্রমণ করতে পারে।
 ২. হ্যাকারদের সহজেই হ্যাক করার সুযোগ করে দিতে পারে। এতে তোমার ব্যাংকে রাখা টাকা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অন্যের হাতে চলে যেতে পারে।
 ৩. তোমার সহজ পাসওয়ার্ডের কারণে আইসিটি যন্ত্রে রক্ষিত তথ্য নষ্ট করার সুযোগ তৈরি হতে পারে।
- কীভাবে মৌলিক পাসওয়ার্ড তৈরি করা যায়? এটি একটি সৃজনশীল কাজ। তোমার সৃজনশীলতাই তোমার তথ্য বা সফটওয়্যারের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চললে কাজটি করতে আমাদের অনেক সুবিধা হবে।

unique পাসওয়ার্ড তৈরির সময় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে:

- নিজের বা পরিবারের কারো নাম বা ব্যক্তিগত কোনো তথ্য সরাসরি ব্যবহার না করা। যদিও পাসওয়ার্ডটি মনে রাখার ক্ষেত্রে এটি আমাদের সাহায্য করে থাকে;
- সংখ্যা, চিহ্ন ও শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ছোট হাতের অক্ষর ও বড় হাতের অক্ষর মিশিয়ে দিলে ভালো হয়। এতে পাসওয়ার্ডটি সম্মূর্কে অন্যের ধারণা করা অনেক কঠিন হয়ে যাবে;
- পাসওয়ার্ডটি যেন অবশ্যই একটু বড় আকারের হয়;
- পাসওয়ার্ড মনে রাখার জন্য আইসিটি যন্ত্র বা ডায়রি বা অন্য কোথাও পাসওয়ার্ড বা এর অংশবিশেষ লিখে না রাখা;
- পাসওয়ার্ড মনে রাখার জন্য নিজের পছন্দের একটি সংকেত ব্যবহার করা। এটি হতে পারে প্রিয় কবিতা, গল্প, লেখক, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা।

এ কাজগুলোর সাথে যদি সৃজনশীলতা যোগ হয় তবে পাসওয়ার্ডটি হয়ে উঠতে পারে unique পাসওয়ার্ড। আমাদের পাসওয়ার্ডগুলো হতে পারে এমন-

- MoriTeChaHina_AmiSunDarVhubanE (প্রাণ-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
- AmAr_AchE_wateR (হুমায়ূন আহমেদ)
- 2BornoT2B_tHatisThe? (To be or not to be, that is the question- From Shakespeare)
- 4Score&7yrsAGO (Four score and seven years ago- From the Gettysburg Address)

তবে পাসওয়ার্ড অবশ্যই মনে রাখার মত হওয়া উচিত।

প্রায়শ পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করাও একটি জরুরি কাজ। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের তথ্য ও সফটওয়্যারের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষা করতে সক্ষম হব।

ওয়েবে নিরাপদ থাকা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। ব্যক্তিগতভাবে মোবাইল, কম্পিউটারের ব্যবহার যেমন বেড়েছে, তেমনি ইন্টারনেট বা অনলাইনের ব্যবহারও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

কাজ

প্রত্যেকে একটি করে পাসওয়ার্ড তৈরি করে উপস্থাপন কর।

যখনই কোনো কম্পিউটার বা মোবাইল ডিভাইস (ফোন, প্যাড, ট্যাব ইত্যাদি) অনলাইনে যুক্ত থাকে তখনই এর নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হয়। সতর্কতা এবং বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই ঝুঁকি কমানো যায়।

একজন অনলাইন ব্যবহারকারী নানান কারণে বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট ব্যবহার করেন। এখানে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ওয়েবে নিরাপদ থাকার বিষয়টি আলোচনা করা হলো।

ক. সাধারণ সাইট : ব্যবহারকারীদের অনেকেই ইয়াহু, হটমেইল বা জিমেইলের মতো সাধারণ এবং বিনামূল্যের ই-মেইল সেবা ব্যবহার করে থাকেন। এগুলোর প্রতিটি সাইটে একাউন্ট হ্যাক হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হ্যাক হলে আমাদের অনেক প্রয়োজনীয় মেইল হারিয়ে যেতে পারে। আবার ঐ একাউন্ট ব্যবহার করে প্রতারণা বা অনুরূপ কাজ হতে পারে যার দায়-দায়িত্ব ব্যবহারকারীর ওপর বর্তায়।

এসব ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সাধারণ সতর্কতাগুলো মেনে চলা দরকার

- ☐ সহজ পাসওয়ার্ড ব্যবহার না করা - অনেকেই তাদের ই-মেইল একাউন্টের পাসওয়ার্ড হিসাবে নিজের নাম, কীবোর্ডের সহজ বিন্যাস (যেমন qwerty বা asdfg বা ১২৩৪৫৬৭৮) ব্যবহার করে। এটি মোটেই সংগত নয়। কারণ ই-মেইলের ক্ষেত্রে ই-মেইল একাউন্ট-ই ব্যবহারকারীর নাম, যা প্রায় সবাই জানে। যে কারণে পাসওয়ার্ডটি যদি সহজ হয় তাহলে যে কেউ মাত্র কয়েকবারের চেষ্টাতেই একাউন্টটি হ্যাক করতে পারবে। এজন্য একটি জটিল বিন্যাস ব্যবহার করা উচিত পাসওয়ার্ড হিসাবে। এবং এতে অক্ষর, সংখ্যা বিশেষ চিহ্ন (!@# ইত্যাদি) ব্যবহার করা উচিত।
- ☐ নিয়মিত পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা : কিছুদিন পর পর ই-মেইলের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
- ☐ যেসব ক্ষেত্রে দ্বিমুখী ভেরিফিকেশনের ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করা। যেমন, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জিমেইল অ্যাকাউন্টটির নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করা যায়। এ জন্য জিমেইলের 2 Step Verificaton অপশনটি ব্যবহার করতে হবে।
 - ☐ ➤ ☐ প্রোফাইল থেকে অ্যাকাউন্ট সেটিংয়ে যেতে হবে।
 - ☐ ➤ ☐ 2-step verification এখানে এডিট অপশনে ক্লিক করতে হবে।
 - ☐ ➤ ☐ মোবাইলের নম্বরটি দিতে হবে এবং সেভ কোড বাটনে ক্লিক করতে হবে।
 - ☐ ➤ ☐ জিমেইল থেকে মোবাইলে একটি সিকিউরিটি কোড পাঠানো হবে। সেটি দিয়ে ভেরিফাই অপশনে ক্লিক করতে হবে।
 - ☐ ➤ ☐ এরপর 2-step verificationটি অন করতে হবে।

এখন কেউ এই অ্যাকাউন্টে অনধিকার প্রবেশ করতে চাইলে তাকে মোবাইল কোডটি পেতে হবে এবং ব্যবহার করতে হবে। যেহেতু কোডটি একবার মাত্র ব্যবহার করা যাবে সুতরাং কেউ আগের কোডটি জানতে পারলেও অ্যাকাউন্টটি থাকবে নিরাপদ। একইভাবে ইয়াহু! মেইলেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

সাইবার ক্যাফে বা অনেকেই ব্যবহার করে এমন কোনো কম্পিউটার থেকে ই-মেইল ব্যবহার করলে, ব্যবহার শেষে অবশ্যই অ্যাকাউন্ট থেকে লগ-আউট করতে হবে।

এছাড়া সাধারণ ওয়েবসাইট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কিছু বাড়তি সতর্কতা মেনে চললে নিরাপদ থাকা যায়। অনেক ওয়েবসাইটে বিশেষ ধরনের প্রোগ্রাম ইনস্টল করা থাকে। ওয়েব ব্রাউজারে কুকিজ চালু থাকলে এসব সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর কম্পিউটার ও ব্রাউজারের বিভিন্ন তথ্য অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়। এসব ওয়েবসাইট

ব্যবহারের সময় সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কোনো কোনো ওয়েবসাইট ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত তথ্য চায়। বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে এই সকল তথ্য দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

খ. সামাজিক সাইট : বর্তমানে অনেকে সামাজিক যোগাযোগ সাইটে নিজের ব্যক্তিগত তথ্য রেখে দেন। ব্যক্তিগত ছবিও অনেকে শেয়ার করে থাকে। ফলে ফেসবুক অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড কেউ জেনে ফেললে তাতে ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। এক্ষেত্রে ই-মেইল সাইটে যে সকল নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মতো অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগের সাইট ব্যবহারের সময় নিম্নোক্ত সতর্কতা মেনে চলা প্রয়োজন :

- ❖ কাউকে ‘বন্ধু’ বানানোর আগে তার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া, বাস্তব জীবনে যে তোমার বন্ধু হওয়ার যোগ্য নয়, তাকে বন্ধু না করা
- ❖ অপরিচিত কাউকে বন্ধু বানানোর সময় তার পরিচয় সম্পর্কে সম্যকভাবে নিশ্চিত হওয়া, এজন্য তার প্রোফাইল দেখা, পারস্পরিক বন্ধুদের মধ্যে কেউ তোমার পরিচিত কি-না সেসব বিষয় দেখে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন
- ❖ খুবই ব্যক্তিগত ছবি ফেসবুকে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা
- ❖ মোবাইলে ফেসবুক/ই-মেইল ব্যবহার করার পর প্রতিবারই লগআউট করা
- ❖ স্কুল, সাইবার ক্যাফেতে ইন্টারনেট ব্যবহার করার পর সাইন আউট করা
- ❖ বন্ধুর বা পরিচিত কারো কম্পিউটার ব্যবহারের সময় সতর্ক থাকা
- ❖ কোনো অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো ফেসবুক এপ্লিকেশন ব্যবহারের অনুরোধ এলে, নিশ্চিত না হয়ে তাতে ক্লিক না করা।

গ. বয়সোপযোগী সাইট : ওয়েবে অনেক সাইট রয়েছে যা কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। এই সকল সাইটে বয়সোপযোগী নানান বিষয় থাকে যা তোমাদের জন্য উপযুক্ত নয়। এ ধরনের ওয়েবসাইট ব্যবহারের ফলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত তথা যন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়েবসাইটে দৃশ্যমান অনাকাঙ্ক্ষিত চিত্র বা বিজ্ঞাপনে ক্লিক করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তোমাদের তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে নৈতিক উন্নয়নে সচেতন হতে হবে।

কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারে আসক্তি

আসক্তি বলে একটা ভীতিকর শব্দ আছে এবং সবাই নিশ্চয়ই এর সাথে পরিচিত। সাধারণত আসক্তি শব্দটা ব্যবহৃত হয় মাদকের সাথে। কোনো একজন ব্যক্তি মাদকে আসক্ত হয়ে গেলে তার জীবনটা কেমনভাবে নষ্ট হয়ে যায় এবং সেখান থেকে বের হয়ে আসা কত কঠিন আমরা সবাই সেটা জানি। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির পাঠ্যবইয়ে কম্পিউটার এবং কম্পিউটার ব্যবহারের মতো এমন চমৎকার একটা বিষয়ের সাথে আসক্তির মতো ভয়ংকর একটা নেতিবাচক শব্দ কেমন করে জুড়ে দেওয়া হলো সেটি নিয়ে তোমাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই অবাক হয়েছ। তোমাদের ভেতর



যাদের কম্পিউটার আছে, তাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে কম্পিউটার গেম খেলতে খেলতে মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে, খেলা বন্ধ করে যখন অন্য একটা জরুরি কাজ করা দরকার তখনো খেলা ছেড়ে উঠতে পারছে না, এরকম অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই কারো কারো হয়েছে। যাদের কম্পিউটারে ইন্টারনেটের যোগাযোগ আছে তাদের কারো কারো হয়তো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে এবং সেই ফেসবুকে তুমি সম্ভবত নিজের সমস্কর্ক কোনো তথ্য দিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছ কখন সেখানে কেউ লাইক দেবে। ফেসবুকে তোমার বন্ধু বাড়লে তুমি হয়তো আনন্দ পেয়েছ এবং ঠিক কম্পিউটার গেমের মতোই ফেসবুক নামে সামাজিক নেটওয়ার্কে তোমার যতটুকু সময় দেওয়া উচিত তোমাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই তার থেকে অনেক বেশি সময় দিয়েছ। এটা হয়তো খুব অস্বাভাবিক নয় যে তুমি যদি ফেসবুকে এত সময় না দিতে তাহলে তোমার পরীক্ষার ফল আরেকটু ভালো হতো। তুমি আরো কয়েকটা চমৎকার বই পড়তে পারতে। মাঠে আরো একটু বেশি খেলতে পারতে। ভাই-বোন, বাবা-মাকে আরেকটু বেশি সময় দিতে পারতে।

তোমাদের অনেকে কম্পিউটার গেম কিংবা ফেসবুকের মতো কোনো একটা সামাজিক নেটওয়ার্কে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সময় ব্যয় কর। এতে সত্যিকারের জীবনের খানিকটা হলেও ক্ষতি করছ যারা এমনটি করছ তারা নিশ্চয়ই এখন কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট নামে ইতিবাচক শব্দটির সাথে আসক্তি নামের নেতিবাচক শব্দটা জুড়েদেওয়ার কারণ বুঝতে পেরেছ! আসক্তি বলতে বোঝানো হয় যখন কেউ জানে কাজটি করা ঠিক হচ্ছে না তারপরও সেই কাজটি না করে থাকতে পারে না। মাদকের জন্যে এটি যেমন হতে পারে ঠিক সেরকম কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও সেটি হতে পারে। মাদক যেমন জীবনের জন্য ক্ষতিকর, বাড়াবাড়ি করা হলে কম্পিউটার কিংবা ইন্টারনেটও সে রকম ক্ষতির কারণ হতে পারে।

কম্পিউটার গেম আসক্তি

কম্পিউটার গেম আসক্তিটা প্রায় সময়েই শুরু হয় শৈশব থেকে এবং বেশির ভাগ সময়ই সেটা ঘটে অভিভাবকদের অজ্ঞতার কারণে। কম্পিউটার একটা Tool এবং এটা দিয়ে নানা ধরনের কাজ করা যেতে পারে। এই প্রযুক্তি সমস্কর্ক এত সুন্দর সুন্দর কথা বলা হয়েছে যে অনেক সময়ই অভিভাবকরা ধরে নেন এটা দিয়ে যা কিছু করা হয় সেটাই বুঝি ভালো, তাই যখন তারা দেখেন তাদের সন্তানেরা দীর্ঘ সময় কম্পিউটারের সামনে বসে আছে তারা বুঝতে পারেন না তার মাঝে সতর্ক হওয়ার ব্যাপার রয়েছে। কম্পিউটার গেম এক ধরনের বিনোদন এবং এই বিনোদনের নানা রকম মাত্রা রয়েছে। যারা সেটি খেলে তারা সেটাকে নিছক বিনোদন হিসেবে নিয়ে মাত্রার ভেতরে ব্যবহার করলে সেটি যেকোনো সুস্থ বিনোদনের মতোই হতে পারে। কিন্তু প্রায় সময়ই সেটি ঘটে না। দেখা গেছে একটি ছোট শিশু থেকে পূর্ণ বয়স্ক মানুষ পর্যন্ত সবাই কম্পিউটার গেম আসক্ত হয়ে যেতে পারে। কোরিয়ায় একজন মানুষ টানা পঞ্চাশ ঘণ্টা কম্পিউটার গেম খেলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল, চীনের এক দম্পতি কম্পিউটার গেম খেলার অর্থ জোগাড় করতে তাদের শিশু সন্তানকে বিক্রয় করে দিয়েছিল। এই উদাহরণগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় কম্পিউটার গেম আসক্ত হয়ে যাওয়া মোটেও বিচিত্র কিছু নয় এবং একটু সতর্ক না থাকলে একজন খুব সহজেই আসক্ত হয়ে যেতে পারে।



কম্পিউটার কিংবা কমিস্ট্রিউটার গেম আসক্তির বিষয়টা যেহেতু নতুন, তাই সেগুলো নিয়ে গবেষণা এখনো খুব বেশি হয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে পুরো বিষয়টি নিয়ে গবেষকরা আরো নিশ্চিতভাবে দিক-নির্দেশনা দিতে পারবেন। এখনই গবেষণায় দেখা গেছে কোনো একটা কমিস্ট্রিউটার গেম তীব্রভাবে আসক্ত একজন মানুষের মস্তিষ্কে বিশেষ উত্তেজক রাসায়নিক দ্রব্যের আবির্ভাব হয়। শুধু তাই নয় যারা সপ্তাহে অন্তত ছয় দিন টানা দশ ঘণ্টা করে কমিস্ট্রিউটার ব্যবহার করে তাদের মস্তিষ্কে র গঠনেও এক ধরনের পরিবর্তন হয়ে যায়।

কাজেই কমিস্ট্রিউটার গেম চমৎকার একটা বিনোদন হতে পারে— কিন্তু এতে আসক্ত হওয়া খুব সহজ এবং তার পরিণতি মোটেও ভালো নয়, সেটা সবাইকে মনে রাখতে হবে।

সামাজিক নেটওয়ার্কে আসক্তি

মানুষ সামাজিক প্রাণী এবং মানুষের নিজেদের ভেতর সবসময়েই একধরনের সামাজিক যোগাযোগ ছিল— কিন্তু ইদানীং সামাজিক যোগাযোগের কথা বলা হলে সেটি মানব সভ্যতার সেই চিরন্তন সামাজিক যোগাযোগ বা সামাজিক নেটওয়ার্কের কথা না বুঝিয়ে ইন্টারনেট-নির্ভর সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধরনের নেটওয়ার্কের কথা বোঝানো হয়। ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, গুগলপ্লাস— এ ধরনের অনেক সামাজিক যোগাযোগ সাইট রয়েছে যেগুলোতে মানুষ নিজেদের পরিচিতদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে। এক সময় এই সাইটগুলো ছিল কম বয়সী তরুণ-তরুণীদের জন্যে, এখন সব বয়সী মানুষই সেটি ব্যবহার করে। শুধু যে একে অন্যের সাথে যোগাযোগের জন্যে এটি ব্যবহার করে তা নয়, একটা বিশেষ আদর্শ বা মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেও এটি ব্যবহার করা হয়। যে উদ্দেশ্যে এটি শুরু হয়েছিল যদি এটি সেই উদ্দেশ্যের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে এটি কোনো সমস্যার জন্ম দিত না, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি সামাজিক যোগাযোগ সাইটে আসক্তি ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীর জন্যেই একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে শুরু করেছে।

মনোবিজ্ঞানীরা এটা নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন এবং এখন এটি মোটামুটিভাবে নিশ্চিত বলা যায় এই সাইটগুলোর সাফল্য নির্ভর করে, সেগুলো কত দক্ষতার সাথে ব্যবহারকারীদের আসক্ত করতে পারে। পুরো কর্মপদ্ধতির মাঝেই যে বিষয়টি রয়েছে সেটি হচ্ছে কত বেশিবার এবং কত বেশি সময় একজনকে এই সাইটগুলোতে টেনে আনা যায় এবং তাদেরকে দিয়ে কোনো একটা কিছু করানো যায়। যে যত বেশিবার এই সাইট ব্যবহার করবে সেই সাইটটি তত বেশি সফল হিসেবে বিবেচিত হবে এবং অবশ্যই সেটি তত বেশি টাকা উপার্জন করবে। কাজেই কেউ যদি অত্যন্ত সতর্ক না থাকে তাহলে তার এই সাইটগুলোতে পুরোপুরি আসক্ত হয়ে যাবার খুব বড় একটা আশঙ্কা রয়েছে।

মনোবিজ্ঞানীরা এই সাইটগুলো বিশ্লেষণ করে আরো একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় আবিষ্কার করেছেন। সব মানুষের ভেতরেই নিজেকে প্রকাশ করার একটা ব্যাপার রয়েছে কিংবা নিজেকে নিয়ে মুগ্ধ থাকার এক ধরনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেটাকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় Narcissism বলে— সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলোতে মানুষের এই সুপ্ত বাসনাকে জাগ্রত করে দেয়। সবার ভেতরেই তখন নিজেকে জনপ্রিয় করে তোলার এক ধরনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। জেনে হোক না জেনে হোক ব্যবহারকারীরা নিজের সম্পর্কে অত্যন্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটি তথ্য সবার সামনে উপস্থাপন করতে থাকে, কেউ সেটি দেখলে সে খুশি হয়, কেউ পছন্দ করলে আরো বেশি খুশি হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি অনেকটা মাদকের মতো কাজ করে এবং একজন ব্যবহারকারী ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের সময় অপচয় করতে থাকে। সামাজিক যোগাযোগের এই আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার কারণে সারা পৃথিবীতে অনেক সময়ের অপচয় হচ্ছে।

আসক্তি থেকে মুক্ত থাকার উপায়

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি মাদকের ন্যায় কম্পিউটার গেম বা সামাজিক যোগাযোগ সাইটেও আসক্তি হতে পারে। তাই মাদকে আসক্তির জন্যে যা যা সত্যি, কম্পিউটার গেম বা সামাজিক যোগাযোগের সাইটে আসক্তির জন্যেও সেগুলো সত্যি। তাই আমরা বলতে পারি একবার আসক্ত হয়ে যাবার পর সেখান থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা থেকে কখনোই আসক্ত না হওয়া অনেক বেশি বুদ্ধিমানের কাজ। যারা এই আসক্তির ব্যাপারটি জানে না তাদের পক্ষে আসক্ত হয়ে যাবার একটা আশঙ্কা থাকে। কিন্তু তোমরা যারা এই লেখাগুলো পড়ছ, তারা নিশ্চয়ই সতর্ক থাকবে যেন সহজেই আসক্ত না হয়ে যাও।

কম্পিউটার গেম এক ধরনের বিনোদন, কাজেই যারা কম্পিউটার গেম খেলবে তাদেরকে জানতে হবে অন্য যেকোনো বিনোদনের জন্যে যেটা সত্যি কম্পিউটার গেম খেলার বেলাতেও সেটা সত্যি। কম্পিউটার এক ধরনের প্রযুক্তি। তাই অনেকেই কম্পিউটার ব্যবহার করে করা যেকোনো কাজকেই প্রযুক্তির এক ধরনের ব্যবহার বলে মনে করে, সেটা মোটেও সত্যি নয়। কম্পিউটার গেম খেলে মোটেও কম্পিউটার প্রযুক্তি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান হয় না, খেলার আনন্দটা হয়। কাজেই কখনোই কম্পিউটার গেম খেলার কারণে নিজের দৈনন্দিন অন্যান্য কাজে যেন ব্যাঘাত না ঘটে সেটি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

আশা করা যাচ্ছে তোমরা কখনো কম্পিউটার গেম আসক্ত হবে না, ঠিক সেরকম তোমাদের চারপাশে যারা আছে তাদেরকেও কম্পিউটার গেম আসক্ত হতে দেবে না। যারা কম্পিউটার গেম আসক্ত হয়ে যায়, তাদের কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষণ থাকে। যেমন তাদের মাথায় সার্বক্ষণিক শুধু সেই গেমটার ভাবনাই খেলা করে, যখনই তারা সেই গেমটি খেলতে বসে তাদের ভেতরে এক ধরনের অস্বাভাবিক উত্তেজনা ভর করে, তাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটতে থাকে। লেখাপড়া অমনোযোগী হয়ে ওঠে। জোর করে তাদেরকে এই খেলা



থেকে বিরত রাখা হলে তাদের শারীরিক অস্বস্তি হতে থাকে। সবচেয়ে যেটা ভয়ের কথা, অনেক কষ্ট করে এই আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া গেলেও হঠাৎ করে কোনো একটা কারণে আবার সেই আসক্তি ফিরে আসতে পারে। যারা কোনো কারণে কম্পিউটার গেম আসক্ত হয়ে যায় তারা যদি এই আসক্তি থেকে মুক্ত হতে চায় তাহলে সবার আগে নিজের কাছে স্বীকার করে নিতে হবে যে তাদের আসক্তি জন্মেছে। তারপর তাকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী কী তার একটা তালিকা করতে হবে। সেই তালিকায় কম্পিউটার গেমের জায়গাটুকু কোথায় সেটি নিজেকে বোঝাতে হবে। তার জীবনের সমস্যাগুলোরও একটা তালিকা করতে হবে। সেই তালিকার সমস্যাগুলোর কোনো কোনোটি কম্পিউটার গেমের কারণে হয়েছে সেটাও নিজেকে বোঝাতে হবে। তারপর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ লেখাপড়া, হোমওয়ার্ক, মাঠে খেলাধুলা, Extra Curricular Activities, পরিবারের সাথে সময় কাটানো, স্নেহ ছাসেবামূলক কাজে সবকিছুর জন্যে সময় ভাগ করে রাখতে হবে। সেই সব কিছুর করার পর যদি কোনো সময় পাওয়া যায় শুধু তাহলেই কম্পিউটার গেম খেলবে বলে ঠিক করে নিতে হবে। ধীরে ধীরে কম্পিউটার গেম সময় কমিয়ে এনে নিজেকে অন্যান্য সৃজনশীল কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে।

যারা সামাজিক যোগাযোগ সাইটে আসক্ত হয়ে গেছে তাদের বেলাতেও আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে একইভাবে অগ্রসর হতে হবে। প্রথমে নিজেকে বোঝাতে হবে এই ধরনের সাইটে অতিরিক্ত সময় দেওয়া

আসলে এক ধরনের আসক্তি। প্রত্যেকবার যখন সামাজিক যোগাযোগ সাইটে কিছু একটা দেখতে ইচ্ছা করবে তখন নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে সত্যি কি তার প্রয়োজন আছে? যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে নিজেকে নিবৃত্ত করতে হবে। প্রত্যেকবার যোগাযোগ সাইটে ঢুকলে সেখানে কতটুকু সময় দেওয়া হয়েছে সেটা কোথাও লিখে রাখতে হবে। দিনে কত ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়, সপ্তাহে কত ঘণ্টা, মাসে কত ঘণ্টা সেটা হিসাব করে সেই সময়টাতে সত্যিকারের কোনো কাজ করলে কতটুকু কাজ করা যেত সেটা নিজেকে বোঝাতে হবে।

সামাজিক যোগাযোগ সাইটে আসক্তি কমাতে হলে সেখান থেকে যোগাযোগের প্রয়োজন নেই এমন মানুষদের কাটছাট করে সংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে। অন্য সব কাজ শেষ হওয়ার পর সময় থাকলেই এই সাইটে ঢোকা যাবে— এটি নিজেকে বোঝাতে হবে। পরীক্ষা কিংবা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট-এর সাথে সামাজিক যোগাযোগ সাইট Deactivate করে ফেলার অভ্যাস করতে হবে। এভাবে ধীরে ধীরে নিজেকে অভ্যস্ত করে আসক্তিটুকু কমাতে কমাতে এক সময় পূর্ণভাবে মুক্ত হতে হবে।

মনে রাখতে হবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। সেই মুহূর্তগুলো সত্যিকার কাজে ব্যয় না করে কোনো একটি আসক্তির পেছনে ব্যয় করা খুব বড় অপরাধ!

পাইরেসি

লেখক, শিল্পীসহ সৃজনশীল কর্মীদের তাদের নিজেদের সৃষ্টকর্মকে সংরক্ষণ করার অধিকার দেওয়া কপিরাইট আইনের লক্ষ্য। সাধারণভাবে, একটি মুদ্রিত পুস্তকের কপিরাইট ভাঙা করে সেটি পুনর্মুদ্রণ করা যথেষ্ট ঝামেলাপূর্ণ এবং ব্যয়বহুল। কিন্তু কম্পিউটারের বেলায় যেকোনো কিছুর ‘কপি’ বা ‘অবিকল প্রতিলিপি’ তৈরি করা খুবই সহজ কাজ। এজন্য এমনকি বিশেষজ্ঞ হওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না। এ কারণে কম্পিউটার সফটওয়্যার, কম্পিউটারে করা সৃজনশীল কর্ম যেমন ছবি, এনিমেশন ইত্যাদির বেলায় কপিরাইট সংরক্ষণ করার জন্য বাড়তি ব্যবস্থা নিতে হয়। যখনই এরূপ কপিরাইট আইনের আওতায় কোনো কপিরাইট হোল্ডারের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় তখনই কপিরাইট বিঘ্নিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। এই ধরনের ঘটনাকে সাধারণভাবে পাইরেসি বা সফটওয়্যার পাইরেসি নামে অভিহিত করা হয়।

কপিরাইট আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা, নির্মাতা বা প্রোগ্রামার তাদের কম্পিউটার সফটওয়্যারের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করতে পারেন। ফলে, তাদের অনুমতি ব্যতীত ওই সফটওয়্যারের প্রতিলিপি করা বা সেটির পরিমার্জনা করে নতুন কিছু সৃষ্টি করা আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ হয়ে যায়। ফলে, কপি বা নতুন সৃষ্টির আইনগত ভিত্তি আর থাকে না। কম্পিউটার সফটওয়্যারের পাইরেসি সোজা হলেও বিশ্বব্যাপী পাইরেসির প্রকোপ খুব বেশি একথা বলা যায় না। বড় বড় সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো তাদের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ ও বিশ্বব্যাপী পাইরেসি নজরদারি করার জন্য বিজনেস সফটওয়্যার এলায়েন্স (BSA) নামে একটি সংস্থা তৈরি করেছে। সংস্থাটির ২০১১ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—পার্সোনাল কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনই পাইরেসিমুক্ত। যেহেতু সফটওয়্যার পাইরেসি খুবই সহজ, তাই এর হিসাব করাটা কঠিনই বটে। বাংলাদেশেও সফটওয়্যার পাইরেসি নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনের প্রয়োজনীয়তা

কপিরাইট আইন সৃজনশীল কর্মের স্রষ্টাকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার সৃষ্টকর্মের ওপর ‘মালিকানা’ বা স্বত্বাধিকার দেয়। ফলে, কোনো সৃষ্টকর্মের বাণিজ্যিক মূল্য থাকলে সেটি তার স্রষ্টাই পান, অন্যরা নন। যেহেতু প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অর্থ প্রয়োজন, সেহেতু কবি, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, সফটওয়্যার

নির্মাতা, ওয়েবসাইট ডিজাইনকারী সবারই টাকার প্রয়োজন। তারা তাদের সৃজনশীল কর্ম সৃষ্টির জন্য পরিশ্রম, মেধা এবং কখনো কখনো অর্থও বিনিয়োগ করেন। কাজেই, সৃষ্টকর্ম বিক্রি বা বিনিময়ের মাধ্যমে তাঁকে তার বিনিয়োগের সুফল তুলতে দেওয়া উচিত বলে মনে করেন অনেকেই। কপিরাইট আইনের আওতায় প্রাপ্ত আইনগত অধিকার তাদের সেই সুবিধাই দেয়।

যদি কোনো শিল্পী বা প্রোগ্রামার দেখতে পান যে, তার দীর্ঘদিনের শ্রম ও মেধার ফসল অন্যরা কোনোরূপ স্বীকৃতি বা বিনিময় মূল্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ছাড়া উপভোগ বা ব্যবহার করছে তাহলে তিনি নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। কপিরাইট আইনের কার্যকারিতা সৃজনশীল কর্মীদের এই নিরুৎসাহিত হওয়া থেকে রক্ষা করে।

তথ্য অধিকার ও নিরাপত্তা

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তথ্য অধিকার (Right to Information) আইন প্রণীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা ও তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ২০০৯ সালে বাংলাদেশে “তথ্য অধিকার আইন ২০০৯” নামে একটি আইন চালু হয়েছে। এই আইনের আওতায় কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার রয়েছে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকেন। এই আইনের মাধ্যমে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্ব ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এই আইনে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি সংস্থাসমূহকে তথ্য সংরক্ষণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ফলে জনগণের যেকোনো বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তি সহজ হয়েছে।

এই আইনের ফলে অনেকের পক্ষে রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে সকল তথ্যের গোপনীয়তার সঙ্গে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িত, সে সকল ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রকাশকে বাধ্যতামূলক রাখা হয়নি। যেমন ধরা যাক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র প্রকাশের জন্য কোনো সংস্থাকে এই আইনের আওতায় বাধ্য করা হলে তা সম্পূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতিকে প্রশ্নবিশ্ব করবে, যা কাক্ষিত নয়। এ কারণে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা তথ্য অধিকার আইন সংরক্ষণ করে। একইভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু কৌশলগত, কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশিত হলে প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সে সকল তথ্য গোপন রাখাটা এই আইনের লক্ষ্য নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যদি কোনো তথ্য প্রকাশ করা হলে দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি হয়, তাহলে তা এ আইনের আওতায় প্রকাশযোগ্য নয়।

এই সকল ক্ষেত্রে আইনের ৭ম ধারায় নিম্নোক্ত ২০টি বিষয়কে এই আইনের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে-

এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে না, যথা-

(ক) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

- (খ) পররাষ্ট্রনীতির কোনো বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশি রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা বা আঞ্চলিক কোনো জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;
- (গ) কোনো বিদেশি সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোনো গোপনীয় তথ্য;
- (ঘ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;
- (ঙ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথাঃ
- (অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারি আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য;
- (আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোনো আগাম তথ্য;
- (ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য;
- (চ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য;
- (ছ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;
- (জ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;
- (ঝ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;
- (ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোনো তথ্য;
- (ট) আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইবুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;
- (ঠ) তদন্তাধীন কোনো বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;
- (ড) কোনো অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;
- (ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য;
- (ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোনো তথ্য;
- (ত) কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোনো তথ্য ;
- (থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;
- (দ) কোনো ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;

(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমতে, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোনো তথ্য;

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমতে, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে। আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

কাজেই দেখা যায় যে, তথ্য অধিকার আইন জনগণের তথ্য পাবার পথ উন্মুক্ত ও সহজ করলেও যেসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, সেসব ক্ষেত্রে তথ্যের নিরাপত্তা সংরক্ষণ করে।

সাধারণ ট্রাবলশুটিং

ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার করবে অথচ কখনো সেটি বিগড়ে যায়নি বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করেনি এমন অভিজ্ঞতার মানুষ পৃথিবীতে বিরল। কিছু কিছু সমস্যা খুবই সাধারণ আবার কিছু সমস্যা জটিল। সাধারণ সমস্যাগুলো অনেক সময় ব্যবহারকারীরাই ঠিক করে ফেলতে পারে। জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কারও মাধ্যমে ঠিক করাতে হয়। কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্রগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। তোমরা যারা ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার কর তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ প্রত্যেকটি যন্ত্রের সাথে একটি করে ম্যানুয়াল বা ব্যবহার নির্দেশিকা থাকে। এ নির্দেশিকার একটি বেশিষ্ট্য হলো এর শেষদিকে এক বা দুটি পৃষ্ঠা থাকে যার শিরোনাম হলো ট্রাবলশুটিং। ট্রাবলশুটিং অংশে সাধারণ সমস্যার প্রকৃতি ও এর সমাধান দেওয়া থাকে।

ট্রাবলশুটিং হচ্ছে সমস্যার উৎস বা উৎপত্তিস্থল নির্ণয়ের প্রক্রিয়া। সাধারণত কিছু প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয় এবং পাশাপাশি সমাধান দেওয়া থাকে। ব্যবহারকারী তার সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী সমাধান অনুসরণের মাধ্যমে বেশিরভাগক্ষেত্রে সমস্যাটি সমাধান করতে পারে।

মূলত ট্রাবলশুটিং হচ্ছে এমন কিছু যা, একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে করতে হয়। অন্য যেকোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্রের তুলনায় কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্রের ট্রাবলশুটিং একটু বেশিই প্রয়োজন হয়। এর একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে এ যন্ত্রগুলো আমরা অনেক বেশি সময় ধরে ব্যবহার করি! তাই আইসিটির ব্যবহারকারীদের অবশ্যই সাধারণ ট্রাবলশুটিং সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। সাধারণত হার্ডওয়্যার সম্পর্কিত সমস্যার ক্ষেত্রে ট্রাবলশুটিং কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিচে কিছু ট্রাবলশুটিং নিয়ে আলোচনা করা হলো।



ক্রমিক	সমস্যা	সাধারণ সমাধান
১.	সিস্টেম চালু হচ্ছে না	<ol style="list-style-type: none"> ১. মেইন পাওয়ার ক্যাবলের সংযোগটি loose বা ঢিলে কিনা দেখতে হবে। ২. মেইন বোর্ডে পাওয়ার আসছে কিনা দেখতে হবে। ৩. মেইন বোর্ডে যদি পাওয়ার না আসে পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট পরিবর্তন করতে হবে। ৪. স্থানীয় কোনো সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে অভিজ্ঞ কাউকে দেখতে হবে।
২.	সিস্টেম সঠিকভাবে চলছে কিন্তু মনিটরে কিছু দেখা যাচ্ছে না।	<ol style="list-style-type: none"> ১. সিস্টেমটি বন্ধ কর এবং মেইন সিস্টেম থেকে পাওয়ার ক্যাবলটি খুলে ফেলতে হবে (সতর্কতার জন্য)। ২. মেমোরি স্লট থেকে সকল র‍্যাম (RAM) সরিয়ে ফেল। ৩. একটি ইরেজার (Rubber) দিয়ে র‍্যাম-এর কানেক্টরগুলোকে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। ৪. শক্ত ব্রাশ দিয়ে সবগুলো র‍্যাম স্লটকে পরিষ্কার করতে হবে। ৫. র‍্যাম ইনস্টল না করে কম্পিউটারটি চালু কর এবং কোনো beep সাউন্ড হয় কিনা খেয়াল করতে হবে। ৬. যদি beep সাউন্ড শুনতে পাও তবে কম্পিউটার বন্ধ করে র‍্যাম ইনস্টল করে কম্পিউটারটি চালু করতে হবে। ৭. যদি কোনো beep সাউন্ড হয় তবে বুঝতে হবে র‍্যামটি সমস্যায়ুক্ত। ৮. এবারও Display না আসলে নতুন র‍্যাম লাগাতে হবে। ৯. র‍্যামকে প্রতিস্থাপন করে আবার চেক কর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে Display না হওয়ার কারণ র‍্যাম-এর সমস্যা। শেষ পর্যন্ত সমাধান না হলে স্থানীয় কোনো সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে অভিজ্ঞ কাউকে দেখাতে হবে।
৩.	সিস্টেম অত্যন্ত গরম হয়ে যায় এবং অস্বাভাবিকভাবে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়।	<ol style="list-style-type: none"> ১. কেসিং টি খোল। ২. মাদারবোর্ড থেকে সতর্কতার সাথে CPU তথা প্রসেসর ফ্যানটি সরাতে হবে। কিন্তু প্রসেসর সরানো যাবে না। ৩. হয়তো দেখবে ভেতরে বা heat sink-এ প্রচুর ধুলোবালি জমে আছে, যা বায়ু চলাচলকে বাধাগ্রস্ত করছে। ফলে CPU ঠান্ডা হতে পারছে না। ৪. Heat sink এবং ফ্যানটিকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে পুনরায় ইনস্টল কর। এবার কেবিনেটটি বন্ধ করে কম্পিউটারটি চালু করতে হবে। ৫. সমাধান না হলে স্থানীয় কোনো সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে অভিজ্ঞ কাউকে দেখাতে হবে।

ক্রমিক	সমস্যা	সাধারণ সমাধান
৪.	কোনোরূপ উদ্ভূত হওয়া ছাড়াই কম্পিউটারটি কয়েক মিনিট পরপর shutdown হয়ে যাচ্ছে।	<ol style="list-style-type: none"> ১. সতর্কতার সাথে মাদারবোর্ডটি ভালো করে দেখে নাও। লিকযুক্ত বা ত্রুটিপূর্ণ ক্যাপাসিটর উপর থেকে খুলে আসছে এরূপ চোখে পড়ে কিনা খেয়াল কর। এক্ষেত্রে ক্যাপাসিটরকে ভালো করে লাগিয়ে নিলেই সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। ২. খুব সতর্কতার সাথে চালু অবস্থায় কম্পিউটারটি খেয়াল কর কোনো IC বা কম্পোনেন্ট অতিরিক্ত তাপ উৎপাদন করছে কিনা। তবে সাবধান, বোর্ডটি যেন shorted না হয়ে যায়। যদি তেমন হয় তবে মেরামতের জন্য তোমার নিকটস্থ সার্ভিস সেন্টারে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।
৫.	উইন্ডোজ রান করার সময় আটকে বা হ্যাং/Hang হয়ে যায়।	<ol style="list-style-type: none"> ১. আপগ্রেড এন্টিভাইরাস চালিয়ে হার্ডডিস্ক কোনো প্রকার ভাইরাস আছে কিনা চেক করে ক্লিন করে নিতে হবে। ২. হার্ডডিস্ক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ডাটা অন্যত্র ব্যাকআপ নিয়ে হার্ডডিস্কের “C” ড্রাইভ ফরম্যাট করে নতুন করে উইন্ডোজ ইনস্টল করতে হবে। কাজটি সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে অভিজ্ঞ কাউকে দিয়ে করানো ভালো।
৬.	পাওয়ার অন করলে Display আসার পর কম্পিউটার Hang হয়ে যায়।	<ol style="list-style-type: none"> ১. প্রথম ধাপ : কম্পিউটারের পাওয়ার অফ কর এবং কেসিংয়ের একপার্শ্বে খুলে হার্ডডিস্ক, সিডিরম কিংবা ডিভিডি-এর সাথে সংযুক্ত ডাটা ক্যাবল এবং পাওয়ার ক্যাবলসমূহ সাবধানে খুলে ফেল এবং এগুলো পর্যায়ক্রমে স্ব স্ব স্থানে যথাযথভাবে সংযোগ দিয়ে পুনরায় কম্পিউটার চালু করে দেখ। যদি সমস্যা থেকে যায় তাহলে— ২. দ্বিতীয় ধাপ : মাদারবোর্ড থেকে RAM, Processor, Power supply connection প্রত্যেকটি আলাদাভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে কোনো প্রকার ত্রুটি কিংবা ক্যাবল কানেকশনের সংযোগস্থলে লুজ আছে কিনা? এরপরও যদি একই সমস্যা থাকে তাহলে— ৩. তৃতীয় ধাপ : অন্য একটি ভালো কম্পিউটার থেকে প্রসেসর র‍্যাম, হার্ডডিস্ক এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্র পাতি এই মাদারবোর্ডে ব্যবহার করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে মাদারবোর্ডটি ঠিক আছে কিনা। যদি ঠিক না থাকে তাহলে মাদারবোর্ড বদলিয়ে ফেলতে হবে। কাজটি সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে অভিজ্ঞ কাউকে দিয়ে করতে হবে। <p>নোট : অনেক সময় কেসিংয়ের পিছনে মাদারবোর্ডটির কীবোর্ড এবং মাউস পোর্টের সংযোগ লুজ থাকলেও এ ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে যথাযথভাবে সংযোগ দিতে হবে।</p>

ক্রমিক	সমস্যা	সাধারণ সমাধান
৭.	কম্পিউটার ঘন ঘন হ্যাং করে বা রিবুট/রিস্টার্ট হয়ে যায়।	<ol style="list-style-type: none"> কম্পিউটারের সিপিইউর উপর সংযুক্ত কুলিং ফ্যানটি না ঘুরলে কিংবা পর্যাপ্ত ঠান্ডা করতে না পারলে এ ধরনের সমস্যা হতে পারে। সেক্ষেত্রে কম্পিউটারের পাওয়ার অফ করে কেসিং খুলে কুলিং ফ্যানটিকে ভালোভাবে চেক করে প্রয়োজনে নতুন কুলিং ফ্যান স্থাপন করে নাও। এছাড়াও কম্পিউটার চলাকালীন তোমার সিপিইউর পিছনে কেসিং-এর ফ্যানটি ঘুরে কিনা তাও চেক করতে হবে। কম্পিউটারে ভাইরাস থাকলেও এ ধরনের সমস্যা হতে পারে। তাই আপগ্রেড এন্টিভাইরাস দ্বারা কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক ড্রাইভের প্রতিটি ড্রাইভ ক্লিন করে নিতে হবে। এছাড়া অনেক সময় নতুন সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম লোড করার কারণেও এটি হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রোগ্রামটি আনইনস্টল করে দেখা যেতে পারে।
৮.	কম্পিউটারের মেটাল অংশে স্পর্শ বা হাত লাগলে শক করে।	<ol style="list-style-type: none"> কম্পিউটারের গায়ে তথা মেটাল অংশে স্পর্শ করলে যদি শক করে তাহলে বুঝতে হবে কম্পিউটারটি আর্থিং করা নেই। সেক্ষেত্রে একজন পারদর্শী ইলেকট্রিশিয়ান দ্বারা যথাযথভাবে আর্থিং করিয়ে নিতে হবে।
৯.	কম্পিউটারের তারিখ এবং সময় ঠিক থাকে না। অথবা বায়োসের কোনো অপশন পরিবর্তন করলে তা সেভ হয় না।	<ol style="list-style-type: none"> মাদারবোর্ডে সংযুক্ত CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) এর ব্যাটারিটি কার্যক্ষমতা হারালে এটি ঘটে। এক্ষেত্রে একটি নতুন অনুরূপ ব্যাটারি মাদারবোর্ডে লাগিয়ে দিতে হবে।
১০.	Boot Disk failure or Hard disk not found মেসেজ দেখায়।	<ol style="list-style-type: none"> কম্পিউটারের পাওয়ার বন্ধ করে কেসিং খুলে মাদারবোর্ড এবং হার্ডডিস্ক ড্রাইভের সাথে সংযুক্ত ডেটা ক্যাবল এবং পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট থেকে হার্ডডিস্কে সংযুক্ত পাওয়ার ক্যাবলটির সংযোগস্থলে কোনো লুজ আছে কিনা তা প্রত্যক্ষ করে সঠিকভাবে কানেক্ট করতে হবে। হার্ডডিস্কের পিছনের জাম্পার সেটিং ডায়াগ্রাম অনুসরণ করে ড্রাইভটির জাম্পার সেটিং ঠিক আছে কিনা তা দেখে সঠিকভাবে জাম্পার সেটিং করতে পারে। কম্পিউটার চালিয়ে বায়োসে প্রবেশ করে হার্ডডিস্ক ড্রাইভটিকে বায়োসের অপশন থেকে অটো কিংবা ম্যানুয়ালি ডিটেক্ট করে কিনা তা দেখ। যদি সমস্যা সমাধান না হয় তাহলে অন্য একটি ভালো কম্পিউটারে তোমার হার্ডডিস্কটিকে লাগিয়ে দেখ হার্ডডিস্কটি কাজ করে কিনা? যদি কাজ না করে তাহলে নিশ্চিত অন্য একটি হার্ডডিস্ক ক্রয় করে কম্পিউটারের সাথে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ইনস্টল করে ফেল। কাজটি অবশ্যই অভিজ্ঞ কাউকে দিয়ে করাতে হবে।

ক্রমিক	সমস্যা	সাধারণ সমাধান
১১.	Out of memory or Not enough Memory মেসেজ দেখায়।	<ol style="list-style-type: none"> সাধারণত কম্পিউটারের অতিরিক্ত প্রোগ্রাম ইনস্টল করতে গিয়ে কিংবা একাধিক প্রোগ্রাম একসাথে ওপেন করে কাজ করতে গেলে এ ধরনের ম্যাসেজ প্রদর্শিত হয়। কম্পিউটারে অতিরিক্ত প্রোগ্রাম ইনস্টল করার মতো পর্যাপ্ত মেমোরি না থাকলে এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ সমস্যা দূর করার জন্য মাদারবোর্ডে অধিক র‍্যাম ব্যবহার করতে হবে।
১২.	কীবোর্ড কাজ করছে না	<ol style="list-style-type: none"> কম্পিউটারটি বন্ধ করে কীবোর্ডটি পোর্টের সাথে যথাযথভাবে সংযোগ করা আছে কিনা সে বিষয়টি লক্ষ করতে পারে। যদি সংযোগ না থাকে কিংবা লুজ থাকে তাহলে ভালোভাবে সংযোগ দিয়ে পুনরায় কম্পিউটার চালু করে দেখতে হবে। এন্টিভাইরাস দ্বারা ভাইরাস ক্লিন করে দেখতে হবে। এরপরও যদি কীবোর্ড কাজ না করে তাহলে নতুন কীবোর্ড লাগিয়ে নিতে হবে।
১৩.	মাউস ডিটেক্ট করে না কিংবা মাউস কাজ করে না	<ol style="list-style-type: none"> কম্পিউটারের সাথে মাউসের ক্যাবল সংযোগ ঠিক আছে কিনা দেখ এবং ভালোভাবে লাগিয়ে পুনরায় পরীক্ষা করতে হবে। পোর্ট পরিবর্তন করে দেখতে হবে। অন্য একটি ভালো মাউস পোর্টে লাগিয়ে দেখতে হবে। বায়োসে প্রবেশ করে দেখ মাউস ডিজ্যাবল করা আছে কিনা? যদি থাকে এনাবল করে দিয়ে সেভ করে বায়োস থেকে বের হয়ে আসতে হবে। এরপরও যদি সমস্যা সমাধান না হয় তাহলে ভালো একটি মাউস লাগিয়ে নাও। সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।
১৪.	মনিটরে কোনো পাওয়ার নাই।	<ol style="list-style-type: none"> পাওয়ার বোতাম (বা সুইচ) চালু আছে কিনা। AC পাওয়ার কর্ডটি মনিটরের পেছনে এবং পাওয়ার আউটলেটে ভালোভাবে সংযুক্ত আছে কিনা নিশ্চিত হতে হবে।
১৫.	মনিটরের পাওয়ার অন/চালু কিন্তু পর্দায় কোনো ছবি নাই।	<ol style="list-style-type: none"> মনিটরের সাথে সরবরাহকৃত ভিডিও ক্যাবলটি কম্পিউটারের পেছনে মজবুতভাবে লাগানো হয়েছে কিনা নিশ্চিত হতে হবে। যদি ভিডিও ক্যাবলের অপর প্রান্তটি স্থায়ীভাবে মনিটরের সাথে যুক্ত না থাকে, তাহলে এটিকে দৃঢ়ভাবে লাগিয়ে দিতে হবে। ব্রাইটনেস (Brightness) এবং কন্ট্রাস্ট (Contrast) ঠিক করে দেখতে হবে।

ক্রমিক	সমস্যা	সাধারণ সমাধান
১৬.	প্রিন্টারে প্রিন্ট হচ্ছে না।	<ol style="list-style-type: none"> ১. প্রিন্টারের সাথে পাওয়ার ক্যাবলটি সংযুক্ত আছে কিনা দেখতে হবে। ২. প্রিন্টার অন/চালু করা আছে কিনা দেখতে হবে। ৩. কম্পিউটারের সাথে প্রিন্টারের ডেটা ক্যাবল সংযুক্ত আছে কিনা দেখতে হবে। ৪. প্রিন্টারের ভিতরে কোনো প্রকার কাগজ কিংবা অন্য কোনো কিছু আটকে আছে কিনা তা প্রিন্টার খুলে ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে। ৫. প্রিন্টারের কার্টিজে কালি আছে কিনা তা দেখ অথবা প্রিন্টার থেকে কার্টিজটি খুলে ভালোভাবে নেড়ে পুনরায় কার্টিজটিকে যথাযথ স্থানে স্থাপন করে দেখতে হবে। ৬. প্রিন্টার চালু করার সাথে সাথে যদি লাল কিংবা ব্লিংকিং হলুদ বাতি জ্বলতে থাকে তাহলে প্রিন্টারের রিসেট বাটনে চাপ দিতে হবে। ৭. যদি সমস্যা সমাধান না হয় তাহলে নতুন করে প্রিন্টারের সাথে সরবরাহকৃত ড্রাইভার সফটওয়্যারটি ইনস্টল করতে হবে। ৮. হার্ডওয়্যারে অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করতে হবে।

দলগত কাজ

উপরোক্ত সমস্যাসমূহ ছাড়াও কম্পিউটারে আর কী কী ধরনের সমস্যা হতে পারে তা আলোচনা করে সমাধানের উপায় চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

১. টেম্পোরারি ফাইল বেশি হলে কী ঘটে?

ক. কম্পিউটার স্লো হয়ে যায়	খ. কম্পিউটারের গতি বেড়ে যায়
গ. এন্টিভাইরাস কাজ করে না	ঘ. ইন্টারনেটে প্রবেশ করা যায় না
২. সিডি, ডিভিডি বা পেন ড্রাইভ থেকে সফটওয়্যার ইনস্টল করতে গেলে কোন প্রোগ্রামটি প্রথমে চালু হয়?

ক. Setup	খ. Autorun
গ. Read me	ঘ. Restart
৩. কোনটি আধুনিক পৃথিবীর সমৃদ্ধ?

ক. তথ্য	খ. উপাত্ত
গ. কম্পিউটার	ঘ. ইন্টারনেট
৪. সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হলে অবশ্যই দেখতে হবে—
 - i. হার্ডওয়্যার সেটিকে সাপোর্ট করে কিনা
 - ii. এন্টিভাইরাস সফটওয়্যারটি বন্ধ করা হয়েছে কিনা
 - iii. এডমিনিস্ট্রেটরের অনুমতি আছে কিনা
 নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

ইকরাম সাহেব দেখছেন কয়েকদিন ধরে তার কম্পিউটার হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় আবার চালু হয়। আরও লক্ষ্য করলেন কম্পিউটারটির কাজের গতিও কমে গেছে। তার মনে পড়লো বন্ধুর পেনড্রাইভ থেকে একটি গান কপি করার পর থেকে এটা শুরু হয়েছে।

৫. কম্পিউটারের এ অবস্থার জন্য কোনটি দায়ী হতে পারে?

ক. অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার	খ. ভাইরাস সফটওয়্যার
গ. ইউটিলিটি সফটওয়্যার	ঘ. এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার
৬. এর ফলে ইকরাম সাহেবের কম্পিউটারে—
 - i. অপ্রত্যাশিত কোনো বার্তা প্রদর্শন করতে পারে
 - ii. রাখা ফাইলগুলোর আকার বেড়ে যেতে পারে
 - iii. মেমোরি কম দেখাতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |
৭. তোমার এক বন্ধু প্রায়ই কম্পিউটারে গেমস খেলে। এতে তার কী কী ক্ষতি হতে পারে? বর্ণনা কর।
 ৮. ‘কম্পিউটারের সাধারণ ট্রাবলশ্যুটিং জেনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ’ - উক্তিটি যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।